কণিষ্ক ভট্টাচার্য

আলোর অধিক

আদিমতম অন্ধকারে কোনোদিন যে মহাবিস্ফোরণের আলো ফুটে উঠেছিল তা প্রসন্ন জানে না। তখন দিন ছিল না, রাত্রিও না। সেই বিস্ফোরণে যখন চলতে শুরু করল সময় তখন অনন্ত অন্ধকারের পাশে আলো এল। অন্ধকার ঘরে রোজ আলো দপদপ করে ওঠে আর শব্দ পিঁক পিঁক করে প্রসন্নর বালিশের পাশে। অভ্যস্ত হাতে প্রসন্ন আওয়াজ বন্ধ করলে বোঝা যায় তখনও জগৎচরাচর শব্দময় হয়ে ওঠেনি। অভ্যাস মতো ফোনের টর্চে প্রসন্ন দেখে নেয় মশারির ধারে মান্তুর হাত ঠেকে আছে কি না। দুর্বল ফ্যানের হাওয়া মশারির জাল ভেদ করে শরীর অবধি আসে না। মাঝখানে শুয়ে তারামণি। ওর ব্লাউজ খুলে মাথার কাছে রাখা। রাতের বিনুনি আলগা হয়ে কপালের কাছে চুল ছড়িয়ে আছে। কণ্ঠার তলায় চ্যাটালো চামড়ার নীচে ওর হাড় গোনা যায়। শাড়ি সরে গেছে বুকের থেকে। অন্তঃসারহীন বুকদুটো দু-দিকে এলিয়ে পড়েছে। নিঃস্ব, নতমুখ। তারামণির পাঁজরার দুই ভাগের মাঝে চামড়া হাড়ের গর্তে ঢুকে গেছে। বুকের ভেতরের প্রাণটার ধুকপুকের কাঁপন দেখা যায় ওই গর্তে। মেয়েটা যখন দুধ খেত তখন ওই বুকেই হাতের মুঠো ভরে উঠত প্রসন্নর। চাপ দিয়ে ধরলে চিরিক করে অন্ধকার ঘরে সাদা আলোর মতো দুধ বেরিয়ে আসত। ভাবতে ভাবতেই প্রসন্ন জোর পেচ্ছাপের চাপ বোঝে। ওর পুরুষ অঙ্গ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিছানা থেকে নামার আগে তারামণির গায়ের পাশে ভর দিয়ে মেয়েটার হাত সরাতে যায় প্রসন্ন। আলো পড়ে তারামণির চোখে। প্রসন্নকে ওর খোলা বুকের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি বুকের ওপরে হাত দেয় তারামণি। ন্যাতানো বুকের বিভাজিকা থাকে না। তবু মাঝেই হাত দেয় তারামণি। বুকে কাপড় না-পেয়ে পিঠটা তুলে আঁচল টেনে আনে বুকের ওপর। বউয়ের দিকে একবার তাকিয়ে মশারি তুলে চৌকি থেকে নামে প্রসন্ন। লুঙ্গিটা বাঁধতে বাঁধতে বাইরে যায়।

তখনও অন্ধকার। অ্যাসবেস্টসের চালের কোনায় আঁটা আছে ভাঙা চাঁদের টুকরো। ও বাড়ির নারকোল গাছের উঁচু পাতাদুটোর জালকাঠিতে ধরা পড়েছে তিনটে ম্লান তারা। কালোর মধ্যে ঘন নীলের ছোঁয়া লাগেনি তখনও। কলঘরের টিনের দরজাটা টেনে পেচ্ছাপ করে প্রসন্ন। করতে করতেই শোনে একটা কাক ডাকে কলঘরের চালে। আরেকটা কাক সাড়া দেয় কোত্থেকে যেন। তারামণির খোলা বুক কি তখন ওকে ডাক দিয়েছিল। এ সময় মরার সময় থাকে না প্রসন্নর। সাড়া দিতে হলে রাতে বাড়ি ফিরে। মান্তু ঘুমোলে। বেরিয়ে ডাক দেওয়া কাকটাকে দেখতে পেলেও সাড়া দেওয়া কাকটাকে দেখতে পেল না প্রসন্ন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক খুঁজে দেখছিল।

কলঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তারামণি। ব্লাউজ পরে টানটান করে শাড়ি

জড়িয়ে নিয়েছে। রোগা চেহারার ওর মুখ ফোলা ফোলা। প্রসন্নকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওপরে এদিক-ওদিক কিছু খুঁজছে দেখে ওকে বলে, 'সরো।' তারামণি কলঘরে ঢোকে। প্রসন্ন ঘরে এসে বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খায়। ব্রাশে মাজন লাগিয়ে গামছাটা কাঁধে ফেলে একটা বিড়ি ধরিয়ে পায়খানায় যাবে বলে বেরোয়। কলঘরের পাশে ছয়কোনা আলাদা ছোটো পায়খানা। কলঘর থেকে বেরোনোর আগে মুখে জল দিয়েছে তারামণি। আঁচল দিয়ে সেই জল মোছে কলঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। ওর পাশ দিয়ে কলঘরের চৌবাচ্চার পারে ব্রাশটা রাখতে যায় প্রসন্ন। তারামণি ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'কী দেখছিলে তখন?' নিমগাছ থেকে সাড়া দেওয়া কাকটা ডেকে ওঠে আবার। প্রসন্ন অন্যমনস্ক গলায় বলে, 'ওই কাকটা...'

তারামণি বলে, 'কাক দেখছিলে! রাতে দেখতে চেয়ো, কাকই দেখাব তখন।' সবুজ নিমগাছ কালো হয়ে আছে। তাতে কালো কাকটা নজরে আসে না। অন্ধকার তখনও কাটেনি।

রাতবিরেতের জন্য কলঘরে একটা জিরো পাওয়ারের হলুদ বাল্‌ব জ্বলে। মাথায় বালতির ঠান্ডা জল ঢালতে ঢালতে সেই মরা আলোর দিকে তাকিয়ে থেমে যায় প্রসন্ন। তারামণির ওই ভেজাকাকের মতো চুপসে যাওয়া বুকের কথা ভাবে প্রসন্ন। ওর থেকে এগারো বছরের ছোটো তারামণি, তায় মাস্তু দুধ ছেড়েছে দু-বছর আগে। অমন ঝুলে যাবে কেন! ঝুলেও ঠিক নয়, শুকিয়ে গেছে তারামণির বুক। বাচ্চা হতে দুধটা-ডিমটা, কী একটু টনিক কিছুই তেমন খাওয়াতে পারেনি প্রসন্ন। রোগব্যাধি ধরেনি হয়তো, তবু অভাব তো একটা রোগই। লেগেই আছে চিটচিটে ঘামের মতো। নুয়ে পড়া আলোয় গায়ে সাবান ঘষে প্রসন্ন।

স্নান সেরে লুঙ্গি দড়িতে মেলে গামছা পরে ঘরে আসে। তারামণি ততক্ষণে চা করে প্রসন্নর জন্য বেগুন ভাজতে দিয়েছে। চা খেতে খেতে জামা প্যান্ট পরে প্রসন্ন। মান্থলিটার তারিখ দেখে বলে, 'কই তোমার হল?' তারামণি রাতের রুটির ওপর বেগুন ভাজার ফালি তুলে পাশে দুটো কাঁচালঙ্কা দিয়ে বাক্সটা প্লাস্টিকে ভরে দেয়। প্রসন্ন বেরোবার আগে তারামণি বলে, 'কাল তোমার ছুটি তো! কাল যাবে তালে?' প্রসন্ন ওর দিকে না চেয়েই বলে, 'যাব।' সাইকেল বের করে কাঁধের ব্যাগটাকে ক্যারিয়ারে আটকে সাইকেলে ওঠে প্রসন্ন। তারামণি ওর পিছন পিছন গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়। অন্ধকার রাস্তায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে প্রসন্নর সাইকেল ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। এই অন্ধকারের ঘর থেকে যাত্রা শুরু করে স্টেশনে সাইকেল রেখে একবার ট্রেন বদলে কারখানা নামে আরেকটা অন্ধকারে গিয়ে ঢুকবে প্রসন্ন। আবার ঘরে ফিরতে ফিরতে অন্ধকার নেমে আসবে ওর জগৎচরাচরে।

দুই

বৃষ্টির পরে রোদ উঠলে যেন বেশি ঝলমল করে চারপাশ। গাছে পাতার ধুলো ধুয়ে চকচকে হয়ে ওঠে। নদীর জলে রোদ্দুর চিকচিক করছে। মা কাপড় থুপছে ঘাটের ধাপে। তারামণি ঘাটের সিঁড়িতে বসে জলে পা ডুবিয়ে রাখে। কচুরিপানা ভেসে যায় দল পাকিয়ে। বৃষ্টিতে নদীর জল বেশি মেটে হয়ে যায়। জলে ভাসতে ভাসতে একটা কালো কাঠ আসে ঘাটের কাছে। তারামণি জলে দুপা নেমে টেনে আনে কাঠটা। হাতে তুলে মা কে ডাকে, 'মা, মা

দেখো!' তারামণির মা এক ঝলক তাকিয়েই চিৎকার করে ওঠে, 'ফেল ফেল! নিঘিন্নে মেয়ে! ধরেছিস কেন ওটা? মরার কাঠ!' তারামণি কেঁপে ওঠে। ভয়ে কী করবে ভেবে উঠতে পারে না। জলে ছুড়ে দিতে গিয়ে, হাত থেকে ছেড়ে দেয় কাঠটা। ওর পায়ের কাছেই পড়ে জলে ভাসতে থাকে ওটা। ভাসতে ভাসতে ওরই পায়ের দিকে আসে। তারামণি ভয়ে পিছোতে গিয়ে পড়ে যায় ঘাটের সিঁড়িতে। ধড়মড় করে উঠে বসে তারামণি। সকাল হয়ে গেছে। আজ আবার সেই স্বপ্নটা দেখল। মরার কাঠ ধরলে কী হয় জানা সেটা হয়নি কখনো তবু এই স্বপ্নটা দেখলে দিন খারাপ যায় তা দেখেছে তারামণি। প্রসন্ন বেরোলে তারামণি রোজই এসে আবার মান্তুর পাশে শুয়ে পড়ে। কোনোদিন ঘুম হয়, কোনোদিন হয় না। আজ একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিল। একে লোকটা আজ কেমন মুখ করে বেরোল, তার ওপর আজকেই এই স্বপ্নটা আবার দেখল।

তখন ওই ফোনের আলোয় ঘুম ভেঙে হঠাৎ ওকে খোলা বুকের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে তারামণি ভয় পেয়েছিল। কেন যে পেয়েছিল কে জানে! রাতে গরমে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তারামণির। ফ্যানের হাওয়া লাগছিল না গায়ে। প্রসন্নর নাকের ডাকে আর ঘুমোতে পারছিল না তারামণি। তখনই গরমে ব্লাউজটা খুলে রেখেছিল। সময়কালে তো গায়ে সুতোটুকু রাখতে দেয় না লোকটা! কিন্তু সে তো জেনেশুনে, ঘুমের মধ্যে তো নয়। প্রসন্ন যে মান্তুকে দেখতে ঝুঁকেছিল সেটা তখন তারামণি বোঝেনি। পরে বুঝেছে আর বুঝেই এই উচাটন শুরু হয়েছে। কেমন মুখ করে বেরোল লোকটা! বলে কিনা, কাক দেখছিল? নিজের বউকেই তো দেখছিল, তাতে অত কথা ঘোরানোর কী আছে বুঝে পায় না তারামণি। আর এমন কী বলেছে যে ওরকম মুখ ঘুরিয়ে 'যাব' বলতে হবে? কী ভাবল লোকটা, তারামণি তো পাঁচবছর কখনো না করেনি ওকে।

পাঁচবছর আগে প্রসন্নর সঙ্গে সম্বন্ধ আসায় মা বলেছিল, 'এখনকার দিনে এত বড়ো ছেলে।' বাবা ওসব কানেই তোলেনি। কোনো নেশাভাং করে না, পাড়ায় মেশে না, বাজে আড্ডা নেই। নিজের কাজ নিয়ে থাকে। নিজেদের ঘর আছে। বাবা খোঁজ নিয়েছিল কারখানাও খারাপ নয়, মালিক লোক ভালো। রোজগার বাড়বে আস্তে আস্তে। এ তো সোনার টুকরো ছেলে। মায়ের ওসব কথা আর আসেইনি। কথা অবশ্য মিথ্যে নয়। বয়েসে যেমন বড়ো প্রসন্ন তেমন বড়োমানুষের মতোই আচরণ করে। ফুলসজ্জার রাতেই তারামণির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। বন্ধুদের কাছে ফুলশয্যার এমন কত গল্প শুনেছিল তারামণি। কম বয়েসে মা-মরা ছেলে, বাপ কষ্ট করে মানুষ করেছে। বাপের শেষসময় সাধ্যমতো করেছে প্রসন্ন। বাপ এতদিন না ভুগলে হয়তো আগেই বিয়ে করতে পারত। তারামণিকে সবকিছুতেই সময় দিয়েছিল প্রসন্ন। শরীরে, মনে। শুধু বলেছিল, পাড়ার ছোটোলোকামিতে যেন তারামণিকে কখনো না দেখে।

প্রসন্ন ভদ্রলোক হতে চায়। চায় বললে পুরো বলা হয় না। বলা ভালো পারিপার্শ্বিকের অন্ধকার কাটিয়ে ও আলো হয়ে উঠতে চায়। ভদ্রলোকদের কথায়-বার্তায় যে আলো দেখা

যায়, তেমন আলো। প্রসন্ন সেভাবে কথা বলে। তারামণিকেও শিখিয়েছে, তবে সবসময় তারামণি সেসব পারে না। একটা সন্তান ভগবান ওদের দিয়েছে, হোক না মেয়ে সন্তান, তাকে ভদ্রলোকের মতো মানুষ করতে চায় প্রসন্ন। লোকে কত বলেছে, একটা সন্তান সন্তান নয়, তার ওপর মেয়ে তো জন্মায় শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্যে। প্রসন্নর স্থির বিশ্বাস মেয়েকেও মানুষের মতো মানুষ করা যায়। তার জন্য মেয়ের মায়ের কাজটা ওর থেকেও বেশি। আর সন্তান চায় না প্রসন্ন, তার ব্যবস্থাও নিজেই নেয়। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। তবু পয়সাকড়ি বাঁচে না। ভদ্রলোকের মতো বাঁচতে কিছু খরচ আছে, কিন্তু সেটা তো করতেই হবে। মেয়েকে ভালো ইস্কুলে পড়াবে বলে খোঁজ নিয়েছে। নতুন ইস্কুল হয়েছে। একটু দূর, তবে ইস্কুলের বাস আসে নিতে। ইংরেজি বলে ওখানকার বাচ্চারা।

বাইরে ঝকঝক করছে আলো। মান্তুকে কোলে করে বিছানা ছাড়ে তারামণি। ওকে নর্দমার পারে পেচ্ছাপ করতে বসিয়ে হাতটা ধরে থাকে। নিমগাছে একটা কাক ডাকে। সকালে কি সত্যিই কাক দেখেছিল প্রসন্ন! ঘরের অ্যাসবেস্টসের চাল থেকে আরেকটা কাক উড়ে এসে নিমগাছে বসে। মান্তুকে ঘরের ধাপে বসিয়ে মাজন লাগিয়ে ব্রাশ ধরিয়ে দিয়ে কলঘরে যায় তারামণি। কলঘরে দাঁড়িয়ে ভাবে, যতই মরার কাঠের স্বপ্ন দেখুক, আজকের দিনটাকে ও খারাপ হতে দেবে না। কোনো কথা যেন আজ ঝগড়ার দিকে না যায়। অবশ্য তারামণি কিছু বললেও ঝগড়া করে না প্রসন্ন। কাল লোকটার ছুটি। এই একটা দিনই দিনের আলোয় প্রসন্নকে দেখতে পায় তারামণি। সেই দিনটা লোকটা বিরক্ত মুখ করে থাকলে কেমন করে লোকটারই বা গোটা সপ্তাহটা কাটে! তার ওপর নিজেই বলেছে মেয়েটার জামা কিনতে যাবে কলকাতায়। তারামণি একবার বলেছিল, 'বাচ্চার জামার আবার অত কী আছে, বাজারের নিউ নগেন্দ্র থেকে কিনলেই হত!' কত লোকের কত বাই থাকে প্রসন্নর এক ভদ্রলোক হওয়ার। নিউ নগেন্দ্রর জামা দেখেছে প্রসন্ন, ও ঠিক শহরের জামার মতো হয় না। জামাকাপড়েই তো আগে ভদ্রলোক আলাদা হয়ে যায়। তাছাড়া তারামণির জন্য একটা শাড়ি কেনার ভাবনা আছে তার। যদিও তারামণিকে সেটা বলেনি। আবার না-বললেও তারামণি সেটা জানে। ওদের নিতান্ত সাধারণ জীবনের মঞ্চে প্রসন্নর এই চমকে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর তারামণির 'ভারি অবাক হয়েছি'র অভিনয়টুকুর বাইরে আর নাট্য-উপাদান কই। জীবনের এই নাটকটা বাঁচিয়ে রাখতে চায় প্রসন্ন। তারামণি তাতে খুশি হয়।

তিন

সেই মার খেল মান্তু।

পোড়া কাঠের স্বপ্নটা দেখলেই দিনটা খারাপ যায় এটা লক্ষ করেছে তারামণি। প্রসন্ন যতই বলুক আশেপাশের কারোর সঙ্গে মিশবে না, তা বললে তো চলে না। তারামণি নিজে পাড়ায় গল্প করতে না-গেলেও পাশের বাড়ির বড়োবউয়ের মেয়েটার সঙ্গে খেলতে যায় মান্তু। ঝগড়া হয় রোজ, তবু যাওয়া চাই। আর না-পাঠিয়ে উপায়ও নেই তারামণির। এখন না-হয় মান্তু একটু বড়ো হয়েছে, একা ঘরে রেখে স্নান কি কাচা-ধোয়া করা যায়। আগে

কোথায়ই বা ওকে রাখত! তখন ওই বড়দি এসে নিয়ে যেত মান্তুকে। প্রসন্নকে বলেনি। পুরুষমানুষের অত ঘরের সব কথা না জানলেও চলে। প্রসন্নও এসব ভেবে দেখেনি কখনো। বাপের বাড়ি থেকে মেয়ে নিয়ে ফেরার পরে কী করে যে একা হাতে তারামণি বড়ো করবে ওকে, সেসব বোধহয় ওর মাথাতে আসেনি। নিজে তো রাত থাকতে বেরিয়ে যায় আবার রাত নামলে ফেরে। মাঝখানে একহাতে মান্তুকে নিয়ে ঘরের কাজ কী করে তারামণি সামলাবে তাও পাড়ার কারও সঙ্গে না মিশে। ভদ্রলোক হয়ে, সেসব প্রসন্নর বোধহয় মাথায় আসেনি কখনো।

মান্তুর হ্যাংলামো দেখে আজ মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল তারামণির। বড়দির মেয়ে ঝুমাও তেমনি। ওর নরম পুতুলটা দেখলে মান্তু ছাড়তে চায় না, সেটাই ও রোজ বার করে আনবে। তারামণি যে রোজ মান্তুর হাত ছাড়িয়ে পুতুলটা রেখে আসবে আর মান্তু রাগ করবে এতে যেন মজা পায় মেয়েটা। তুই বাচ্চাটাকে ধরতে দিবি না তাহলে অত দেখানোর কী আছে? বড়দির এসবে হেলদোল নেই। সে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে পান চিবোতে চিবোতে কুটনো কুটবে আর মাঝে মাঝে দাওয়ার কোনায় পিচিক করে পিক ছুড়ে ওর সঙ্গে গল্প করবে। সময়মতো পিক ফেলতে ভুলে গেলে হিক্ হিক্ করে হিক্কা তুলবে। মান্তুকে যেমন কিছু বলে না তেমন নিজের বাচ্চার দিকেও তার নজর নেই। তারামণি ওদের কিছু বলতে গেলে বলে, 'বোস তো বউ। সারাদিন সংসারের জোয়াল টেনে হেজেমজে গেলি। ওদের পেছনে আর টিকটিক করতে হবে না। আমার মায়ের ছটা বাচ্চা ছিল। আমরা ছ-ভাইবোন। কে কবে এমন পিছনে লেগে থেকেছে! আমার তো তাও দুটো, তোর একটা। কবে থেকে বলছি আরেকটা হোক। কতই বা বয়েস তোর!'

কথা অন্য দিকে ঘুরে যায় এদিকে মান্তু ঘ্যান ঘ্যান করে পুতুলটার জন্যে। ঝুমাও দেয় না। বড়দি রান্নার কথা বলে যায়। সামনে পুজো, টাকাপয়সার টানাটানির কথা বলে যায়। কুটনো কুটতে কুটতে তার জুলফির নীচ দিয়ে ঘাম নামে। ঠোঁটের কষের থেকে পিকের রেখা গড়ায়। ও ঘরে মান্তু কাঁদে, ঝুমা বলে— 'দেব না যাহ্।' কথাটা বড়দির কানে গেছে। বড়দি বলে ওঠে, — 'ও কী, ছোটো বাচ্চার সাথে অমন করছিস কেন?' ঝুমা বলে, 'দেব না। দেব না। ব্যস।' মান্তু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। তারামণি উঠে গিয়ে একটা চড় বসিয়ে দেয় মান্তুর গালে। মান্তু তাতে আরও কাঁদতে থাকে। মেয়েটার ড্যানা ধরে হিড়হিড় করে ছেঁচড়ে নিয়ে যায় ঘরে। বড়দি অবাক হয়ে যায় তারামণির হাবেভাবে। বলে, 'ও বউ বাচ্চাটাকে মারিস না! বাচ্চাকাচ্চা এমন করে।' পানের পিক গিলে ফেলেছে বড়দি। হিক্কা উঠতে থাকে। তার মধ্যেই গজগজ করে নিচু গলায়, 'এই এক হয়েছে এদের ভদ্দোরলোক হওয়ার নেশা...' আবার হিক্কা ওঠে। মেয়েকে ডাকে, 'ও ঝুমা, ঝুমা একটু জল গড়িয়ে দিয়ে যা তো, আমার হাত জোড়া।'

ঘরের দরজাটা ঠেলে আরেকটা চড় বসায় মান্তুর গালে। মান্তু আরও জোরে কাঁদতে থাকে। তারামণি চিৎকার করে, 'মনে নেই, মনে নেই, বাবা সেবার নকুলদানা কিনে দিয়েছিল!' চার বছরের বাচ্চারা সে কথা মনে থাকার কথা নয়। এমনকী নকুলদানাটা কিনে দেওয়া যে মান্তুর জন্যে শাস্তিমূলক সেটা বোঝার বয়েসও মান্তুর হয়নি। কিন্তু ওই যে প্রসন্ন ভদ্রলোক

হবে। কাজ থেকে ফিরে সেদিন মেয়েকে কোলে করে দোকান করতে বেরিয়েছিল প্রসন্ন। পাড়ার মুদি দোকানের হরিদা রোজ মাস্তুর হাতে দুটোচারটে নকুলদানা দেয়। ওতেই হাত ভরে যায় মাস্তুর। প্রসন্ন বোঝে এই পাড়ায় সবার ধারবাকির খাতা চললেও প্রসন্ন তা খোলে না। ওর এক কথা, পয়সা না থাকলে কিনবে না, কিন্তু খাতায় যাবে না। ওসব ভদ্দরলোকের কাজ নয়। এমন নগদ খরিদ্দারের বাচ্চার হাতে চারটে নকুলদানা দিয়ে যদি তাকে খুশি রাখা যায় তাতে হরির লাভ। প্রসন্ন প্রথমদিকে বলেছে, 'হরিদা রোজ এমন দিয়ো না, মেয়েটার স্বভাব খারাপ হবে।' হরিদা হেসে বলে, 'রাখো তো! এইটুকু বাচ্চা তার আবার স্বভাব খারাপ। তুমিও আছ প্রসন্নভাই!' সেদিন হরির দোকানে খুব ভিড়। মাস্তুকে কোল থেকে নামাতেই ও গিয়ে হাত পাতল, 'নকুই! নকুই খাব।' হরি বোধহয় শুনতে পায়নি। মাস্তু আবার বলল, 'নকুই খাব ...' হরি যেন তাকিয়ে দেখল না বলে মনে হল প্রসন্নর। মাসের শুরু তখন নানা লোকের খাতার জমা মেলানোর কাজ। সেইসব বুঝেও ওই মাস্তুর কথাটা না-শোনাটা খুব গায়ে লাগল প্রসন্নর। ও তখনই মাস্তুকে কোলে চাপিয়ে দোকানের চাতাল থেকে নেমে আসে। তখন হরি ডাকে, 'ও প্রসন্ন ভাই, চলে যাচ্ছ নাকি?' প্রসন্ন ফিরে বলল, 'আসছি মেয়েটাকে রেখে। ঘ্যান ঘ্যান করছে।' মেয়েকে খপ করে ঘরের মেঝেতে বসিয়ে সেদিন থমথমে মুখে প্রসন্ন বেরিয়ে গিয়েছিল। অন্য জিনিসের সঙ্গে পঞ্চাশ নকুলদানা কিনে এনে, নিজেই একটা স্টিলের প্লেট এনে গোটাটা প্লেটে ঢেলে মাস্তুকে বলেছিল, 'তুই এই গোটাটা খাবি আজ। সবকটা খেয়ে তবে উঠবি এখান থেকে।'

সকাল থেকেই সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে আজ, তারামণি ভাবে প্রসন্ন আসার আগে সব কাজ সেরে গুছিয়ে রাখবে। ওর সামনে কোনো কাজ নিয়ে বসবে না আজ। মেয়েটাকে স্নান করাতে গিয়ে দেখল পায়ের পাতায় ছড়ে গেছে ছেঁচড়ে আনতে গিয়ে। স্নান করিয়ে একটু লাল ওষুধ লাগিয়ে দেবে ভেবেও আবার বোরোলিন লাগাল। লাল ওষুধ দেখে যদি প্রসন্ন কিছু জিজ্ঞেস করে! ভালো করে স্নান করল তারামণি। ছোবা দিয়ে গা ঘষল যত্ন করে। পাটপাট করে চুল আঁচড়ে পরিষ্কার একটা শাড়ি পরে মেয়েকে খাইয়ে ঘুম পাড়াল। তারপর নিজে খেয়ে শুলো মাস্তুর পাশে। কিন্তু ঘুমোতে পারল না।

চার

সময়ের আগেই আজ প্রসন্নর সাইকেলের ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ পেয়ে তারামণি তাড়াতাড়ি দরজা খুলতে যায়। আলো প্রায় মরে এসেছে তখন। তারামণির কেমন একটা মনে হয়েছিল লোকটা যেন আজ ইচ্ছে করেই দেরি করে ফিরবে, যদিও কোথাও আর যাওয়ার নেই প্রসন্নর। দরজা খোলার সময় নিজের অস্বস্তি ঢাকতে একটা হাসি দেয় তারামণি।

চারবছরে পড়লেও মেয়েটা এমনিতে কথা বেশি বলে না। আজ প্রসন্ন কলারের রুমাল আর জামাটা দড়িতে রেখে বসতেই মাস্তু বলে উঠল, 'মা মারেছে।' প্রসন্নর ভুরু কুঁচকে যায়, 'কে মেরেছে! কেন?' মাস্তু এবার পায়ের ছড়ে যাওয়া জায়গাটায় আঙুল দেখিয়ে আবার বলে, 'মা মারেছে।'

'মারেছে নয়, বল মেরেছে। কেন মেরেছে? কী করেছিলি?' তারামণির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী করেছে ও?' পুরোটা বললে আরও অনেক কথা আসবে তাই প্রসন্নর সামনে চায়ের কাপটা নামিয়ে তারামণি বলল, 'ঘ্যান ঘ্যান করছিল।'

'পায়ে ছড়ল কী করে?'

'ওই মাটিতে।' প্রসন্ন চুপ করে গেল। সারাদিন একাই সামলাতে হয় তারামণিকে প্রসন্ন বোঝে।

আলো একেবারেই মরে গেছে। অন্ধকার নেমে এসেছে চারপাশে। দুজনের কেউই আর কিছু কথা বলল না। মান্তুও আর কোনো কথা না বলে রান্নাবাটির ঝুড়িটা টেনে খেলতে বসল। ছোটো বেলনচাকি, ছোটো কড়াই, প্লাস্টিকের গ্যাস স্টোভ আর সিলিন্ডার, ছোটো ছোটো থালা। মান্তুর ছড়ানো ছোট্ট সংসারের দু-পাশে নিশ্চুপে বসে রইল প্রসন্ন আর তারামণি। তারমণি বসে রইল প্রসন্ন যদি কিছু বলে এই ভেবে কিন্তু প্রসন্ন চুপ করে মেয়ের খেলা দেখে গেল। কাপের চা জুড়িয়ে গেল দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে। অন্ধকারের মধ্যে কোত্থেকে দুটো কাক ডাকছিল বাইরে। তারামণি হঠাৎ উঠে ঘরের বাল্‌ব জ্বালিয়ে দিয়ে উঠোনে গিয়ে বসল।

নিমগাছে খেলা করছিল কাকদুটো। হাওয়া নেই তবু ডালগুলো বারবার দুলে উঠছে। ঘামে পা চিটচিট করছিল তারামণির। পায়ের পাতায় মশা ছেঁকে ধরছে বারবার। দু-তিনবার কাপড় নেড়ে মশা তাড়িয়ে উঠে পড়ল তারামণি। ঘরে এসে কাপড় নিয়ে গা ধুতে গেল। রাতে মাথায় জল দিলে ওর ঠান্ডা লাগে তবু আজ ঝপঝপ করে জল ঢালল মাথায়। আজ সকাল থেকেই সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। খানিকটা ইচ্ছে করেই প্রসন্নর সামনে থেকে উঠে এল তারামণি। এমন কী হয়েছে যে একটা কথা বলা যায় না। যেন অশুচ চলছে বাড়িতে! ঝপঝপ করে আরও ক-মগ জল মাথায় ঢেলে বেরোল তারামণি। ঘরে এসে দেখল প্রসন্ন গামছা পরে স্নানে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রসন্ন উঠে গেলে কাপ নিতে গিয়ে দেখল ওই ঠান্ডা চা-টাই খেয়েছে প্রসন্ন। চুল আঁচড়ে রাতের রান্না করতে বসল তারামণি। স্নান করে সকালের ধোয়া লুঙ্গিটা পরে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বিড়ি ধরাল প্রসন্ন। রান্না শেষ হলে প্রসন্নকে খাবার বেড়ে দিয়ে মান্তুকে খাওয়াতে বসল। প্রসন্ন বলল, 'ওকে খাইয়ে নাও না, তারপর একসাথে খাব।' তারামণি কোনো উত্তর দিল না, থালা চাপা দিল প্রসন্নর খাবার। মান্তুকে বলল, 'এই তাড়াতাড়ি মুখ নাড়া।' খাওয়া হলে মান্তুকে শুইয়ে দিয়ে এল তারামণি। মান্তু মশারির মধ্যে এপাশ-ওপাশ করতে করতে নিজেই নিজেই কথা বলছিল। খেতে খেতে প্রসন্ন বলল, 'কাল তালে যাবে তো? সকাল সকাল বেরোব তবে। তুমি একটু ভাত বসিয়ে দিয়ো।' দরজার ফাঁক দিয়ে ভাঙা চাঁদটাকে দেখতে পেল তারামণি। কেমন আলো পড়ছে নিমগাছের পাতায়।

মশারির মধ্যে গরম লাগলেও আজ ব্লাউজটা খুলে শুল না তারামণি। মান্তুকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতেই পাশে প্রসন্নর নাকের ডাক শুনতে পেয়েছে। ব্লাউজের ওপরের বোতামটা খুলে বুকের কাপড়টা সরিয়ে রাখল। তাতেও গরম যায় না। হাওয়া ঢোকে না মশারির ভেতর।

ভাঙা চাঁদটার কথা ভাবতে ভাবতে চোখ লেগে এল তারামণির। চোখ খুলল যখন রোজকার মতো শেষরাতের অ্যালার্ম বাজার সময়ে প্রসন্নর চেনা হাত ওকে জড়িয়ে ধরে। আজ বেড়াতে যাওয়ার দিন, কলঘরে যাওয়ার সময় কাকদুটোকে দেখে মনে হয় তারামণির।

আলো আর কিছুই নয় কেবল অসংখ্য ধাতুর দাহ। বিরাট নক্ষত্রের মধ্যে যে অবিরাম দাহ তার অবশেষকে মানুষ আলো বলে জানে। সেই আলো তার শরীরের মধ্যে অদেখা যে মন তাকেও জাগিয়ে তোলে। কালকের সারাদিনের পরে আজ ভোররাতে যখন প্রসন্ন ওকে জড়িয়ে ধরল তখন সব অন্ধকার কেটে গিয়ে তারামণির চ্যাটালো বুকের ভেতর যে মনটা আছে সেইখানে আলো পৌঁছে গিয়েছে। তারামণি আজ যে শাড়িটা পরবে সেটা বের করে রাখল। ব্লাউজের হাতাটা গলিয়ে দেখল আরও ঢলঢল করছে, সুঁচসুতো বের করে টেঁকে নিল। খাটের নীচ থেকে চামড়ার চটিজোড়া বের করে রাখল। মেয়েটার ঠিকঠাক মাপের জামা একটা বের করল। এর থেকে এক সাইজ বড়ো নিলেই বছর চলে যাবে। এসব করতে করতেই প্রসন্ন উঠল। ওকে চা করে দিয়ে নিজেও সামনে বসে চা খেল তারামণি। প্রসন্নকে বলল, 'আমাকে একটা শ্যাম্পুর পাতা এনে দাও না।'

মান্তুকে তৈরি করে স্নান খাওয়া করে বেরোতে বেরোতে সেই সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। মাকে দেখে মান্তুর মনে হল মায়ের মতো একটা ব্যাগ ওরও চাই। তারামণি নিজের একটা পুরোনো চেন কাটা ব্যাগ দিল মান্তুকে। মান্তু সেই বড়ো ফিতের ব্যাগ একবার এই কাঁধে একবার ওই কাঁধে করে ঘুরছিল। প্রসন্ন ওকে ধরে ব্যাগটা এক কাঁধ থেকে অন্যদিকের কোমরে করে দিল। তারামণি টানটান বিনুনি করে ক্লিপ দিল শ্যাম্পু করা চুলের দু-পাশে। সিঁদুর পরল সরু চিরুনি দিয়ে। সোয়েটের একটা টিপ পরল। ঠোঁট রাঙাল লিপস্টিকে। শাঁখা পলার সঙ্গে চুড়ি পরল হাতে, সোনালি ঘড়িটাও পরল। গলায় একটা ইমিটেশনের হার দিল নকল পাথরের লাল লকেটওয়ালা। বেড়াতে যাওয়ার জন্য যতটা সাজ করা যায় ততটাই করে ফেলল। মান্তু আবার এর মধ্যেই ঝুমাকে গিয়ে ওর সাজ দেখিয়ে এল, আজ মান্তুর বেশি উৎসাহ ব্যাগটা দেখানোর।

পাঁচ

ঝগড়া হলে লোকে বলে বটে ভদ্দরলোক জামাকাপড়ে লেখা থাকে না, কিন্তু ওই দেখেই যে চেনে সেটা এই বাজারে ঢুকলে বোঝা যায়। এমনিতে ওদের লাইনে ট্রেন কম, তাই দিনে দুবার শিয়ালদা নামলেও প্রসন্নর যাওয়া হয়নি। একবার বল্টুর সঙ্গে ঘড়ি সারাতে বেরিয়ে দেখেছিল প্রসন্ন। এসব কি নিউ নগেন্দ্রতে হয়! প্রসন্নর মেয়ে প্রসন্নর মতো ভদ্রলোক হবে। কারখানায় তো প্রসন্নকে এই বল্টুরাই সমীহ করে কথা বলে। মালিকও ওকে সম্মান করে, ভরসা করে। বুঝদার হিসেবে মানে প্রসন্নকে। আবার সময়ে সময়ে ওর থেকে খবর নেয় কারখানায় কেমন চলছে সব। প্রসন্ন বোঝে সেটা, তাই কিছু কথা চেপে রেখে বলে। মালিকের দালাল হওয়া ভদ্রলোকের কাজ নয়। বাজারের সামনে গিজগিজ করছে লোক। সামনে পুজো, ভিড় হবেই। মেয়ের হাত ধরে প্রসন্ন এগোয় ভিড়ের দিকে। বাজারের কাচের গেটের সামনে

দুজন সিকিউরিটি দাঁড়িয়ে। ছাই-ছাই জামা, নীল প্যান্ট পরে। তারা প্রথমেই তারামণিকে আটকায়, 'ম্যাডাম ব্যাগটা ওই দিকে...' বলে ডানদিকে হাত দেখায়। তারামণি বোঝে না। প্রসন্ন এগিয়ে যায়। তারামণিকে নিয়ে গিয়ে ব্যাগ রেখে টোকেন নিয়ে আসে। মান্তুর ব্যাগটার হ্যান্ডেলে একটা প্লাস্টিকের লক লাগিয়ে দেয়।

'এসি লাগানো?' তারামণি প্রসন্নর কাছে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে? প্রসন্ন হাসে। তারামণির মনে হয় এটা আগে বললে মান্তুর জন্যে একটা গরম জামা আনত। তারামণি একটু কিন্তু কিন্তু মুখ করে প্রসন্নকে বলে, 'একটু ঘুরে দেখি?' প্রসন্ন বলে, 'হ্যাঁ দেখো না।' তারামণি মান্তুর হাত চেপে ধরে থাকে। প্রসন্ন বলে, 'ছেড়ে দাও, এখানে চোখের ওপরে হারাবে না।' তবু মান্তু এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রসন্ন হাতে ধরে নিয়ে আসে।

কমবয়সী সব ছেলেমেয়ে কেমন 'মেডাম মেডাম' করে কথা বলছে তারামণিকে। প্রথমে তো তারামণির হাসি পেয়ে গিয়েছিল। আর এত রকমের জিনিস একজায়গায় এটা সবচেয়ে অবাক করে তারামণিকে। কী নেই, জামাকাপড় তো আছেই, টিভি ফ্রিজ, খাট-বিছানার জিনিস, রান্নার বাসনকোসনের দিকে আরও কত যন্ত্রপাতি আছে সেগুলো তারামণি চেনে না। এ যেন এক অদ্ভুত জায়গা। মানুষের সারা জীবনের যত কিছু ইচ্ছে সবকিছু দিয়ে যেন এঁরা সাজিয়ে রেখেছে জায়গাটা। এর বেশি কারও কিছু চাওয়ার থাকতে পারে না। ভদ্রলোক হবে বলে সারাক্ষণ গোমড়া মুখ করে থাকা প্রসন্নকে এখানে এসে যেন অন্যরকম লাগে তারামণির। প্রসন্ন দেখে, মাঝে মাঝে লজ্জা পেয়ে হাসার মতো একটা হাসি মুখে ওর দিকে তাকাচ্ছে তারামণি। আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে যাচ্ছে। প্রসন্ন হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরে। তারামণি খুব লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিতে টান দেয়, এ বাবা এত লোকের মাঝে, এভাবে! প্রসন্নর হাতের জোরে সেটা হয় না। আর এখানে সেভাবে কেউ যে ওদের দেখছে তেমনও নয়। তারামণি প্রসন্নর পাশে পাশে চলে ঠিকই তবু এসির মধ্যেও ওর হাতের পাতা ঘামতে থাকে লজ্জায়।

অনেক বেছে বেছে তবে মান্তুর পিঠে ফেলে জামা দেখল তারামণি। একটু সপ্রতিভ হয়ে সেলসের মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, 'দাম এত এটার?' মেয়েটা জামায় লাগানো ট্যাগ দেখে দামটা বলল। বাবাহ্ এতো দাম! প্রসন্নর মুখের দিকে তাকায় তারামণি। প্রসন্ন কিছু বলে না। পরের জামা দেখতে গিয়ে নিজেই দাম পড়ে নেয়। অনেক বেছে বেছে মান্তুর জামা নেওয়া হয়। প্রসন্ন একটা শাড়িও কিনে দেয় তারামণিকে। কাল ঘুম ভাঙা থেকে দিনটা বিচ্ছিরি ছিল। আজ সকালে সেই অন্ধকারটা কেটে গেছে। আজ তারামণির দিন। তারামণি আজ প্রসন্নকে চমকে দেবে বলে তৈরি হয়েই বেরিয়েছে। প্রসন্নকে বলে, 'মেয়েটাকে একটু দেখো, আমি আসছি।' প্রসন্ন একটু অবাক হলেও খুশি হয়, এই যে তারামণি নিজের মতো ঘুরছে এটা ওর ভালো লাগে। মান্তু পুতুল দেখছে। স্টিলের পাইপ দিয়ে বানানো কতগুলো চৌবাচ্চা মতো করা আছে তাতে ডাঁই করে রাখা আছে পুতুল। তারামণি ফিরে আসে বিজয়িনীর মতো হাতে একটা টিশার্ট নিয়ে। দাম দেখে নিয়েছে নিজেই, এই টাকা ওর ব্যাগে আছে। প্রসন্ন

না-না করে ওঠার আগেই ওর পিঠে ফেলে কাঁধ মাপে তারামণি। মাপও ঠিক আছে। প্রসন্ন কিছু একটা বলতে গেছিল, তারামণি বলে, 'একদম না, এটা আমি কিনব।'

দাম দেওয়ার লাইনে প্রসন্নই দাঁড়াল। তারামণি ওর পিছনে মাস্তুর হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। এত বড়ো বাজার কিনা ওদের ব্যাগ বাইরে রেখে আসতে বলে জিনিস দেওয়ার জন্য আবার প্লাস্টিকের দাম নিল, এটা আবার কেমন কথা বুঝল না তারামণি। তবে এমন একটা দিন প্রসন্ন তারামণির জীবনে যেন আর আসেনি। টিশার্টটা কিনতে পেরে তারামণি যেন বাজারের গ্লেজড টাইলসের মেঝে থেকে একটু ওপরে ভাসতে ভাসতে চলেছিল। এই পিছল মেঝেতে পিছলে যাচ্ছিল ওদের স্টেশন বাজারের নিউ নগেন্দ্র, পাড়ার হরিদার দোকান। শীতল হাওয়ার কত ভালো সাজগোজ করা লোকের ভিড়ে নিজেকেও যেন স্পেশাল মনে হচ্ছিল তারামণির। প্রসন্নর কাল সকালের মন খারাপটা শান্ত হয়ে এসেছিল তারামণির সপ্রতিভতায়। সত্যিই একটু যত্ন নিলে তারামণিও ভালো থাকবে। একটু ভালোভাবে থাকা, ভদ্রভাবে থাকা— এর বেশি কিছু চায়নি প্রসন্ন। মেয়েটাকে এবার ওই ভালো ইস্কুলে দিতে পারলে...

এক্সিট লেখা কাচের দরজায় কাছে ওদের কাছে বিল চাইল। সিকিয়োরিটির দুজন দাঁড়িয়ে একজন কমবয়সী ছেলে একজন বয়স্ক লোক। প্রসন্ন বিল দিতে কমবয়সী চেক করছিল। তখন ভেতরের দিক থেকে ওদের দিকে আসতে আসতে সিকিয়োরিটির পোশাকের সঙ্গে ব্যাজ পরা একজন গলা তুলে বলল, 'হ্যালো! হ্যালো!' প্রসন্ন বুঝল ওদের লাক। ওকে কে হ্যালো বলবে! মেয়েটার হাত ধরে ও কাচের দরজা পেরোল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যাজ পরা লোকটা কমবয়সীকে বলল, 'দাঁড় করাও। আটকাও, আটকাও।' কমবয়সী ছেলেটিও প্রথমে বোঝেনি ওদের কথা বলছে। ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল তিনটে ধাপ। ঠান্ডা থেকে বেরিয়ে বাইরে মনে হল হলকা বইছে।

কমবয়সী ছেলেটা এবার তৎপর হয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এল। নীচের চাতালে ভিড় থিকথিক করছে। সুন্দর পোশাক পরা মহিলা পুরুষেরা দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চারা হাতে আইসক্রিম নিয়ে চাটছে। কাচের দরজার সামনে একটা লাইন পড়েছে ভেতরে ঢোকার। পাশাপাশি ওদের বেরোনোর দরজা। সিকিয়োরিটির ছেলেটা নেমে এসে প্রসন্নর সামনে একটা হাত মেলে দাঁড়িয়ে তাকে আটকায়। মুখ যথাসম্ভব কঠিন। ছেলেটা বলে, 'স্যার একটু দাঁড়িয়ে যাবেন।'

ততক্ষণে ব্যাজ পরা লোকটা ওদের সামনে চলে এসেছে। তারামণি জড়োসড়ো হয়ে প্রসন্নর পাশে দাঁড়ায়। প্রসন্ন মেয়েটার হাত শক্ত করে ধরে থাকে। কী হয়েছে কিছু বুঝে পায় না। ব্যাজ সিকিয়োরিটিকে বলে, 'ওই ব্যাগটা দেখো তো।' মাস্তুর ব্যাগটা দেখায় লোকটা। সিকিয়োরিটির ছেলেটা এগোতে মাস্তু ব্যাগটা চেপে ধরে হাতে। কাচের দরজার পাশে দের ঘিরে লোক জমে গেছে চারপাশে। সিকিয়োরিটির ছেলেটা মাস্তুর ব্যাগ থেকে বের করে একটা ছোট্ট নরম পুতুল। যেমন পুতুল ঝুমার আছে একটা। ব্যাজ প্রসন্নর দিকে তাকিয়ে বলে, 'স্যার এটার বিলটা?'

চারপাশের লোকজন ওদের তিনজনকে দেখছে। এক মহিলা তার উৎসাহী বাচ্চাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ভিড় থেকে 'যতসব ছোট্‌লোকি ব্যাপার, চলে এসো।'

প্রসন্ন পুতুলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ও জানে এটা ওরা কেনেনি। ওদের দেখার ভিড়ে ঢোকার গেট আটকে গেছে। এক্সিট গেট থেকে লালটাই পরা এক স্টাফ বেরিয়ে এসে, 'এখানে ক্যাওস কেন? খালি করো তাড়াতাড়ি।'

এমন অবস্থায় প্রসন্ন কখনো পড়েনি। ও বলতেই পারল না বাচ্চা মেয়ে ভুল করে নিয়েছে। একটা পুতুল কিনে দেওয়ার সামর্থ্য কি নেই প্রসন্নর! তবুও কেমন ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে থাকল লাল টাইয়ের মুখের দিকে।

'বিলটা স্যার...' প্রসন্ন ওদের কেনাকাটির বিলটা এগিয়ে দেয়। ব্যাজ তারামণির দিকে তাকিয়ে বলে, 'ম্যাম, ব্যাগটা ওকে দিন।' তারামণিও ব্যাগটা এগিয়ে দেয়। জিনিস ভরার পরে প্লাস্টিকটা একটা লক করে দিয়েছিল ওরা। সেটা লাগানোই আছে। ছেলেটা লকটা কেটে তিনটে জিনিস বিলের সঙ্গে মিলিয়ে আবার ব্যাগে ভরে লাল টাইকে বলে, 'আর কিছু নেই।' ব্যাজ চোখ কুঁচকে প্রসন্নর দিকে তাকায়। মাটিতে যেন মিশে যায় প্রসন্ন, ওই অন্ধকার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না আর। সিকিয়োরিটির ছেলেটা আবার বলে, 'পুতুলের বিলটা স্যার? লাল টাই ছেলেটাকে বলে, 'ছেড়ে দে। মালটা নিয়ে গেটে যা।'

প্রসন্নরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে ভিড়, সুন্দর জামা পরা ছোটো ছেলেমেয়েরা ওদের দেখছে। প্রসন্ন জানে না আসলে গোটাটাই ক্যাওস। আদিম মহাবিস্ফোরণের পর থেকে সমস্ত মহাবিশ্ব এগিয়ে চলেছে একটা ক্যাওসের দিকে। কোন কৃষ্ণগহ্বর কবে কোন নক্ষত্রকে আলোসহ শুষে নেবে সেটা এরাও কেউ জানে না। অন্ধকার নেমে আসছে। রাস্তার উল্টোদিকের সরকারি হাসপাতালের দেওয়ালে দুটো মরা আলো জ্বলে উঠল তখন।